OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 390 - 399
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

হুমায়ূন আহমেদের ‘নন্দিত নরকে’ : নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ অন্বেষণ

শিরিন আক্তার
প্রভাষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ
ও
গবেষক, বাংলা বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : shirin.akterju43@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Humayun Ahmed, Life and works, Fiction, Quest of Question, Stylistics, Dipiction, Men and women, Post Liberation war, Middle class.

Abstract
Humayun Ahmed (1948-2012) is one of the greatest Bengali fiction writer in the era of 20th century. Not only fiction writer but also he is known as Bangladeshi filmmaker, composer and playwright, songwriter, scholar and academic. Humayun Ahmed made his debut on fiction era by appearing the famous novel- Nandito Noroke (1972). He picked up the Bangladeshi civil middleclass society on his plot of this novel. This article will emphacise on how his colossal writing makes reader understand the circumstance through the age. He imitates the life of men and women in the civil society in his point of view. The major concern of this article is to give importance to bring out the quest of life of men and women in his novel named Nandito Noroke. After liberation war (1971) we found him as a powerful fiction writer who potrayed the pulse of middle-class family based on the real scenario of hope, desire, expections. Humayun Ahmed's novel especially early aged writings are very lively, dynamic and meaningful. His conscious depiction of thought gives the fiction a new era. This writing will provide a clear concept about the nature of character's quest of questions and their expectation and reality. The complexity of life is described wonderfully through his protagonist of the novel. The point of view of indivisual mind, soliloquy and psychoanalysis took an important place in characterisation. So, stylistics will also be a part of this article. This paper has been designed through the lens of literary and cultural approach including critical analysis.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

জননন্দিত কথার যাদুকর হুমায়ূন আহমেদের (১৯৪৮ - ২০১২) প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম। স্বাধীনতা উত্তর বাংলা উপন্যাসের ধারায় ও বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবন রূপায়ণে নিঃসন্দেহে এটি একটি স্বতন্ত্র সংযোজন। ব্যক্তিগত বোধ, সামাজিক অবস্থান, শ্রেণি বৈষম্য, প্রতিবেশ বর্ণনা এবং মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বকে পাশাপাশি রেখেই উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণ করেছেন লেখক হুমায়ূন আহমেদ। তাই প্রতিটি চরিত্রের জীবন জিজ্ঞাসার স্বরূপ অন্বেষণে তাঁর নির্মিত চরিত্রগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোনো শিল্পই দেশকাল বিশ্লিষ্ট নয়। কারণ দেশকালের আলো-বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় প্রাণরস আহরণ করেই শিল্পমানস হয়ে ওঠে লালিত ও বর্ধিত। মানস গঠনে ঐতিহ্য ও পরিবেশ পালন করে এক কার্যকর ভূমিকা।[১] নিম্ন মধ্যবিত্ত পারিবারিক জীবন অঙ্কনের পাশাপাশি লেখক তাদের দৈনন্দিন সম্পর্কগুলোর ওপর সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলোর প্রতি একই সাথে সচেতন ও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন যা নিঃসন্দেহে লেখকের দূরদর্শী ভাবনার প্রতিফলন বলা যায়। হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে অবশ্য এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার মানস গঠন। এক্ষেত্রে একটু পেছনের প্রেক্ষাপট আলোচনা আবশ্যক -

১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর শাসন ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে। একই বছর বাংলা - বিহারে দেওয়ানী প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের এই ক্ষমতার পথ যেন এগিয়ে যায় এক ধাপ। এরপর ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথা প্রবর্তনের ফলে বাংলায় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীতে ১৮০০ সালে 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ' প্রতিষ্ঠা, ১৮১৭ সালে 'হিন্দু কলেজ', ১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের 'নব শিক্ষানীতি' ইত্যাদি নানান ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি সমাজে গড়ে ওঠে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। ইংরেজদের শাসন ও শোষণনীতির প্রভাবে শিল্প-সাহিত্য, চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সামগ্রিকভাবে বাঙালি জনমানসে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে যেভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে পুঁজিবাদী সভ্যতার মাধ্যমে সামন্তবাদকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তান - ভারত-বাংলাদেশে তা হয়নি।[২] ব্রিটিশদের হাত ধরে অখন্ড বাংলায় জন্মলাভ করেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক কাঠামো। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত তৈরি হয়েছিল ব্রিটিশদের হাত ধরে, তৎকালীন ঔপনিবেশিক স্বার্থে মেকলের কেরানি ব্যবস্থায় 'বাবু' নামক বৃত্তিকে আশ্রয় করে এবং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রথার মাধ্যমে। 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে' এর সময় জমিতে যে ভোগদখল সত্য বলে ঘোষিত হয় সেই ভূমিস্বত্বের উপর আশ্রয় করেই বাঙলা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রথম দাঁড়িয়ে ওঠে। পরে সরকারি চাকুরিও হয় তার দ্বিতীয় আশ্রয়।[৩]

অর্থাৎ উপরিউক্ত মন্তব্য দুটিকে পর্যালোচনা করলে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা লাভ করা যেতে পারে। সাংস্কৃতিক রুচি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা হল মধ্যবিত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই দুই বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই এদের করতে হয় জীবিকা নির্বাহ।[৪]

এছাড়াও ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের মধ্যে ঘটে গেছে দেশভাগ, দাঙ্গা, মন্বন্তরের মতো দুর্বিষহ ঘটনা। ফলে সাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে জীবনের এসব কথকতা। এর মধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী শিল্প-সাহিত্যে মার্ক্স ও ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের ব্যাপক প্রভাব দেখা যায়। ফলে বাঙালি মানস গঠনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা দোলাচালের সাথে পরিলক্ষিত হয় পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, দ্বিধা-দ্বন্দ্বসহ মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা। একদিকে উপরিউক্ত প্রেক্ষিতগুলো যেভাবে সাহিত্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে তেমনি মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবেগ-বিহ্বল মানসিকতাও অঙ্কিত হয়েছে শিল্প-সাহিত্যে। হুমায়ূন আহমেদের মানসপটেও এসকল প্রেক্ষিতগুলো নিয়মের অবধারিত প্রবহমানতায় সঞ্চারিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। *নন্দিত নরকের* মধ্যে তাই আমরা প্রত্যক্ষ করি মধ্যবিত্ত জীবনের নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাত, আবেগ-বিহ্বলতা সংগ্রাম, স্নেহ-ভালোবাসা, পারিবারিক পরিবেশ ও বন্ধনের এক সাবলীল বয়ান।

শুধু উপন্যাসের বিষয় বা প্লট নির্মাণে চমৎকারিত্ব নয়, চরিত্র নির্মাণে পরিণত মনোভাব, নামকরণের প্রতীকী ব্যঞ্জনা, ভাষিক উপস্থাপনের পাঠকপ্রিয় সারল্য, বিদেশি শব্দের আরামদায়ক উপস্থিতি, উপমার যথাযথ প্রয়োগ,

লোকবিশ্বাসের যুৎসই ব্যবহার ও সর্বোপরি লেখকের ন্যারেটিভ স্টাইল সব মিলিয়ে নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার যে বাস্তবধর্মী আখ্যান রচিত হয়-তার স্বরূপ বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ আলেখ্য হয়ে উঠেছে।

হুমায়ূন আহমেদের 'নন্দিত নরকে'র কাহিনি বর্ণনায় চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বন্দ্ব-সংকট, ভাষার বর্ণনায় সারল্য, পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানের দুটে আলাদা আলাদা চিত্র এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র রাবেয়ার জীবনে সমাজের প্রভাব এবং তার পরিণতিসহ শেষে মন্টু কর্তৃক মাস্টার কাকাকে খুন, খুনের কারণ না বলা এবং সবশেষে মন্টুর ফাঁসির আদেশ-এই সবকিছুই যেন একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু হয়ে অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছে। এরপর রাবেয়ার জীবনের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় খোকার পরিবারটির এলোমেলো হয়ে যাওয়া, একটা পরিবারের সকল সদস্যদের সীমাহীন ও অনিশ্চিত ক্লেদাক্ত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যেন শত শত বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ফুটে উঠেছে। মানসিকভাবে স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন রাবেয়া যেন কিছুতেই সমাজের অন্য দশজন মানুষের জীবনের মতো স্বাভাবিক জীবনের নিশ্চয়তা প্রত্যাশা করতে পারে না। রাবেয়াকে ঘিরে গল্পের কথক চরিত্র খোকার বয়ানে যেন উপন্যাসের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে।

লেখক এখানে ঘটনার কার্যকারণ বলতে যেয়ে খোকার মুখ দিয়ে বর্তমান থেকে অতীতে বিচরণ করে আবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিয়ে নির্মোহ বাস্তবতার কাছে ফিরিয়ে এনেছেন। উপন্যাস পাঠ করতে গিয়ে তাই কখনো কখনো হঠাৎ চেতনা-প্রবাহরীতির বয়ানের মতোই পাঠকের প্রাণে দোলা দিয়ে যায় -

> "আমরা বহু কষ্ট পেয়ে মানুষ হয়েছি। আমাদের ছেলে মানুষি কোনো বাধ কোন বাসনা আমার বাবা-মা মেটাতে পারেন নি। আজ আমি সমস্ত বেদনার সমস্ত দুঃখে শান্তির প্রলেপ জুড়াব। আলাদীনের প্রদীপ হাতে পেয়েছি শক্তিমান দৈত্যটা হাতের মুঠোয়।"[৫]

উপরিউক্ত মন্তব্যটি থেকে খোকা তথা রাবেয়ার পারিবারিক-সামাজিক-আর্থিক সংকটের সাথে সাথে মধ্যবিত্তীয় স্বপ্ন-সাধ-আশার এক মেলবন্ধন চিহ্নিত হয়েছে। খোকা যেন কাহিনির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব ঘটনাকে নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করে এবং স্বীয় আবেগকে পরিশীলিতভাবে প্রকাশ করে। শীলুর জন্য তার হৃদয়ের অনুরণন যেন হৃদয়েই ঝর্ণাধারা হয়ে প্রবাহিত হয়। সে প্রবাহ কখনোই নদীর প্রবাহমানতা হয়ে সমুদ্রের সাক্ষাৎ লাভ করে না। হৃদযের গভীরে শীলুকে নিয়ে মনে মনে ভালোবাসার জাল বুনে চললেও বাস্তব জগতে তার পূণর্তা প্রাপ্তির সাক্ষাত লাভ করতে দেখা যায় না। খোকার ভাবনা -

> "কবে আসবে শীলু যাকে আমি 'করুণা' বলে নিজের মনেই ডাকি। করুণা ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকবে বাগানে, নিজের খেয়ালে গান উঠবে আচমকা। আমাদের বাসার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় ভাববে, রুনু, রুনু বাসায় আছ? এর জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম। ভালোবাসা সম্পর্কে আমার ধারণা নেই। কিন্তু আমি বুকের ভেতর গোপন ভালোবাসা পুষেছি।"[৬]

নিজের ভালোবাসার কথা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে খোকা যেমন নির্মোহ তেমনি রাবেয়ার করুণ মৃত্যুর ক্ষেত্রেও তার নিয়ন্ত্রণহীন আবেগ পরিলক্ষিত হয় না। এমনকী মধ্যবিত্ত ক্লেদাক্ত জীবনের মা-বাবার একান্ত মুহূর্তের কথা বুঝতে পেরেও তার আবেগ সংযমহীন হয়ে ওঠে না।খোকার বর্ণনায় -

> "মাঝ রাতে বাবা যখন 'শানু শানু এই শাহানা' বলে ডাকতে থাকেন, তখন আমার কান গরম হয়ে ওঠে। নাক ঘামতে থাকে। হার্টের স্পন্দন দ্রুত কথা ও আমার জানা। মা বলেন, আহ কর কী? ছি! বাবা ফিসফিস করে কী বলেন। তাঁর গলা খাদে নেমে আসে। মা জড়িত কণ্ঠে হাসেন, আমি দু'হাতে আমার কান বন্ধ করে ফেলি।"[৭]

মা-বাবা ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতি রয়েছে তার তীব্র ভালোবাসা। বড় বোন রাবেয়া, ছোট বোন রুনু ও ছোটভাই মন্টুর প্রতি রয়েছে প্রচন্ড স্নেহ-ভালোবাসা। মা-বাবাসহ বাবার বন্ধু মাস্টার কাকার প্রতি রয়েছে তার সীমহীন

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রদ্ধাবোধ। আর্থিক হিসেব কষে চলা নিম্ন মধ্যবিত্ত সংসারে পড়ালেখা শেষে একটা ভালো বেতনের চাকরির প্রত্যাশায় যেন তার ভবিষ্যতের সমস্ত স্বপ্ন আবর্তিত হতে চায়। রুনুকে নিয়ে তার স্বপ্ন -

> "আমি রুনুকে অনেক বড় করব। রুনু ডাক্তার হবে বড় হলে। স্টেথোস্কোপ গলায়, কালো ব্যাগ হাতে মেয়ে ডাক্তারদের বড় সুন্দর দেখায়। রুনু অঙ্ক ভালো পারে না। আমি তাকে নিজের পড়া বন্ধ রেখে অ্যালজেবরা বোঝাই। ডাক্তারি পড়তে অবশ্যি অঙ্ক লাগে না।"[৮]

আদরের ছোটবোন রুনুকে নিয়ে তার স্বপ্ন যেন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকের স্বার্থহীন চাওয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে।সেই সাথে বড় ভাই হিসেবে তার দায়িত্ব সচেতনতাও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। ছোটভাই মন্টু তার মায়ের পেটের ভাই না হলেও তার প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা খোকার হৃদয়ের উদারতাকেই চিহ্নিত করে -

> "মন্টু হয়তো আমাকে খুব শ্রদ্ধা করত। বড় চাপা ছেলে, বুঝবার উপায় নেই তবে শ্রদ্ধা করত ঠিকই। না শ্রদ্ধা নয়, ভালোবাসা বলা যেতে পারে। ...প্রবল ভালোবাসা না থাকলে সন্ধাবেলা বসে কেউ প্রতীক্ষা করে না কখন বড় ভাই এসে গাছ থেকে নামিয়ে নিয়ে যাবে।"[৯]

ভাই-বোনদের প্রতি যেমন খোকাকে স্নেহশীল পাই তেমনি পরিবারের সবার প্রতিও পাওয়া যায় দায়িত্বশীল আচরণের বাস্তব দৃষ্টান্ত। সৎ মা হলেও বড় মার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না -

> "বড় মা আমাদের অতি শ্রদ্ধার মানুষ। রাবেয়া আর আমি অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকে জড়িয়ে না ধরে ঘুমোতে পারিনি। যখন বয়স হয়েছে, তাঁর কোলে এসেছে মন্টু। আমি আর রাবেয়া দক্ষিণের ঘরে নির্বাসিত হয়েছি, তখনো তিনি মাঝে মাঝে বলতেন, খোকা, আজ তুই শুবি আমার সাথে। আগে আমার সঙ্গে ঘুমুবার জন্য এত হৈচৈ করতিস, এখন যে বড় চুপচাপ?"[১০]

আবার, বাবার বন্ধু শফিক সাহেবের প্রতিও তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ পরিলক্ষিত হয় -

> "মাস্টার কাকাকে খুব ভালে লাগে আমার। অদ্ভুত মানুষ। বয়সে বাবার সমান। বিয়ে-টিয়ে করেননি। দুই যুগের বেশি আমাদের সঙ্গে আছেন। কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। বাইরের কেউ যদিও তা বুঝতে পারে না। বাইরের কেন, আমি নিজেই অনেক দিন পর্যন্ত তাঁকে বাবার আপন ভাই বলেই ভেবেছি।"[১১]

উপন্যাসটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খোকার আত্মকথন ও তার উপস্থিতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পাশের বাড়ির ধনাঢ্য পরিবারের মেয়ে শীলুর প্রতি তার আবেগ ও আবেগ প্রকাশের সীমাবদ্ধতা যেন সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর দুই মেরুতে বসবাস করা দুইটি পরিবারের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য তুলে আনার সাথে সাথে চিন্তা-চেতনা ও রুচির পার্থক্যকেও চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ভালোবাসা প্রকাশে যেমন সংযমী খোকা তেমনি পরিবেশ-পরিস্থিতির সাপেক্ষে তার প্রতিক্রিয়ায় নির্লিপ্ততাও পরিলক্ষিত হয়। তবুও খোকা প্রতিনিয়ত স্বপ্ন বুনে চলে পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে নিয়ে ভালো থাকার -

> "আমি সমস্ত কিছু বুঝতে চাই। আমি সবাইকে ভালোবাসি। যে সংসার বাবা গড়ে তুলেছেন সেখানে আমার যা ভূমিকা আমি তারচে' অনেক বেশি করতে চাই। যদি কোনো জটিলতা এসেই থাকে তবে সে জটিলতা থেকে আমি দূরে থাকতে চাই না। আমি চাই সবাই সুখী হোক রুনু শীলুর মতো একটা ময়না এনে পুষুক যেটি সময়ে-অসময়ে মানুষের মতো সুকের শিস দিয়ে উঠবে।"[১২]

খোকার এই ভালো থাকার স্বপ্ন পূরণের হাতিয়ার একটা ভালো চাকরি। যেখানে চিরকাল বাঙালি মধ্যবিত্তের স্বপ্নকে আমরা কেন্দ্রিভূত হতে দেখি। খোকার চাওয়া-পাওয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। একটা সময় খোকার স্বপ্ন পূরণের সেই সোনার কাঠি-

ভালো চাকরি ঠিকই হয় কিন্তু সেই উচ্ছ্বাস আর পুলক যে কেন উদযাপন করতে পারে না পাঠক ঠিকই তা বুঝতে পারেন। নতুন দিনের প্রত্যাশায় প্রহর গুণতে থাকা খোকা চরিত্রটি যেন আবহমান বাঙালি সমাজের চিন্তাশীল ও দায়িত্বশীল যুবকের চিরচেনা রূপটি স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাইশ বছরের স্বল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ে রাবেয়া। রাবেয়া আর খোকার বয়সের পার্থক্য এক বছর হলেও তাদের চিন্তার জগতের পার্থক্য রয়েছে। তাকে ঘিরেই এগিয়ে যায় মূল কাহিনি। তার কাছে জীবন ও জগতের সংজ্ঞা অন্য দশজনের মতো নয়। অত্যন্ত সরল চিন্তার অধিকারী রাবেয়ার মধ্যে জগতের কুটিলতা নেই। জগতের কুটিলতা তার মধ্যে না থাকলেও কুটিলতা ও জঞ্জাল তাকে আক্রান্ত করে এবং ভয়াবহ পরিণতি নিয়ে আসে যা তার মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি -

> "রাবেয়া ঘুরে ঘুরে সেই কথা কটিই বারবার বলছিল। রুনুর মাথা নিচু হতে হতে থুতনি বুকের সঙ্গে লেগে গিয়েছিল। আমি দেখছিলাম তার ফর্সা কান লাল হয়ে উঠছে।"[১৩]

ঠিক কী কথা লেখক তা প্রকাশ না করলেও পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না যে কথাগুলো নিশ্চয়ই শোভনীয় নয় যা খোকার ভাষ্যে আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয় -

> "ছি! রাবেয়া, এসব বলতে আছে? ছিঃ। এগুলো বড় বাজে কথা। তুই কত বড় হয়েছিস। ...সে আমার কথা মন দিয়ে শুনল। কিছুক্ষণ ধরে বালেশের গায়ে চাদর জড়িয়ে সে একটা পুতুল তৈরি করছিল। আমার কথায় তার ভবাবান্তর হলো না। পুতুল তৈরি বন্ধ রেখে লম্বা হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। পা নাচাতে নাচাতে সেই নোংড়া কথাগুলি আগের চেয়েও উঁচু গলায় বলল।"[১৪]

ভালো-মন্দের পাথর্ক্য রাবেয়ার বোধগম্য নয়। আপাত দৃষ্টিতে সুস্থ সবল হলেও বয়সের সাথে সাথে বুদ্ধির বিকাশ রাবেয়ার ঘটেনি। ফলে পরিবেশ সর্ম্পকে তার আন্দাজ নেই বললেই চলে। পাশের বাড়ির হারুন মনে মনে রাবেয়াকে পছন্দ করে কিন্তু হারুনের মা পছন্দ করে না এবং হারুনের মায়ের মনোভাব যেন সমাজের অন্যান্য মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রতিনিধিত্ব করে। কোনরূপ সহানুভূতি নয় বরং হারুনের মায়ের চোখে -

> "হারুনের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মেয়ে রাবেয়াকে বিয়ে করতে চায়। আপনার মেয়েকে পাঠাবেন না ওখানে। কী করে সে ছেলের মন ভুলিয়েছে। মাথার ঠিক নেই একটা মেয়ে। ছি!"[১৫]

হারুনের মায়ের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে আর্থিক প্রতিপত্তির অহমবোধ। এই অহংকারে ধরাকে সরা জ্ঞান করেন তিনি। হারুনের মায়ের মতো শত শত অবিবেচক স্বার্থপর চরিত্র যেন আমাদেরই চারপাশে বিরাজমান। যারা মনে মনে নিজের সন্তানের ক্ষেত্রে ষোল আনাই বুঝতে পারে আর অন্যের সন্তানের প্রতি সামান্য সহমর্মিতাটুকু প্রদর্শন করার মতো মানবিকতাটুকুও লালন করে না। এর বিপরীত চিত্রও পরিলক্ষিত হতে দেখা যায় হারুনের বোন ও পরবর্তীতে হারুনের স্ত্রী নাহারের সাথে রাবেয়ার সুসর্ম্প দেখা যায়। স্বল্প আয়ের সংসারে রাবেয়ার চিন্তায় যেন পরিবারের অন্য সদস্যরাও চিন্তামগ্ন হয়ে ওঠে। মায়ের চোখের নিচে কালি জমে, বাবার মাথার ভিতরের দুঃসহ যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে এবং বাবার মুখে উচ্চারিত হয়ে যায়-'বিষ খাইয়ে মেরে ফেল মেয়েকে'। আর্থিক অসঙ্গতি আর জীবনের অসহায়ত্ব এমনভাবে পীড়িত করেছে যে বাবার মুখ দিয়ে এমন যন্ত্রণাকাতর সংলাপ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পারম্পার্যে এক সময় অন্য একজনের সাথে রাবেয়ার বিয়ে ঠিক হলেও তার বিয়ে শেষ পর্যন্ত ভেঙে যেতে দেখা যায় -

> "মাস্টার কাকা একটা ফরসা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন, বরপক্ষীয়দের অভ্যর্থনার জন্য। পাঁচটায় তাদের আসার কথা, ছ'টা পর্যন্ত কেউ এলো না। জানা গেল কেউ আসবে না। একটি পাগল মেয়ে গছিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র তারা কী করে যেন জেনেছে।"[১৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এ ঘটনার কিছুদিন আগেই চৈত্র মাসের দারুণ এক উষ্ণ দুপুরে রাবেয়া হারিয়ে গিয়েছিল। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাস্টার কাকা তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন। এরপরের ঘটনা অত্যন্ত ভয়াবহ সেই সাথে হৃদয় বিদারকও। এই ঘটনার কিছুদিন পর রাবেয়ার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যাওয়ার লক্ষণ ধরা পড়ে মায়ের চোখে। লোক লজ্জায় এবং জানাজানি হবার আশঙ্কায় সম্পূর্ন অগোচরে রাবেয়ার এবোরশন করানো হয় এবং প্রচন্ড রক্তপাতের ফলে রাবেয়ার মৃত্যু হয়। রাবেয়া যেন এই পৃথিবীরূপী নরক থেকে অনন্তের পথে এগিয়ে গেল। কথক খোকার ভাষ্যে -

> "রক্তে মেজে ভেসে যাচ্ছে। আমি থমকে দাঁড়ালাম। এবোরশন নাকি? কাকে দিয়ে কী করালেন? নাকি নিজে নিজেই কিছু খাইয়ে দিয়েছেন?"[১৭]

একটু একটু করে যেন মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে রাবেয়া -

> "বেলা নটায় চুপচাপ মরে গেল রাবেয়া। তখন চারদিকে শীতল ভোরের কী ঝকঝকে আলো।"[১৮]

পরিবার ও তথাকথিত সমাজ থেকে যেন মুক্ত মিলল রাবেয়া নামক নিষ্পাপ ফুলের। মৃত্যুর আগে রাবেয়া হারিয়ে যাওয়া পোষা কুকুর পলা-কে খুঁজেছে। বারবার বুক খালি হবার কথা বলেছে। মৃত্যুর মতো এমন নির্মম ঘটনাকে খোকার ভাষ্যে লেখক হুমায়ূন আহমেদ এত নির্লিপ্তভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন এটি একটি নিত্যদিনের স্বাভাবিক ঘটনা। অথচ রাবেয়ার মৃত্যুর সাথে সাথে যেন পাঠকের হৃদয়াবেগ মিলে এক শোকাচ্ছন্ন পরিবেশ তৈরি করে।

রাবেয়ার এই করুণ মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি রাবেয়ার ছোট ভাই মন্টু। মন্টু রাবেয়ার মায়ের পেটের ভাই না। তার বাবার প্রথম স্ত্রীর সন্তান। মায়ের পেটের ভাই না হলেও রাবেয়ার প্রতি মন্টুর ভালোবাসার কমতি ছিল না -

> "বারোটার দিকে ফির এলেন মাস্টার কাকা। সঙ্গে শহর থেকে আনা বড় ডাক্তার। আর মন্টু দিনেদুপুরে অনেক লোকজনের মধ্যে ফালাফালা করে ফেলল মাস্টার কাকাকে একটা মাছকাটা বটি দিয়ে।"[১৯]

স্বল্প কথা বলা মন্টু যে মাস্টার কাকাকে খুন করবে তা কেউ কোনদিন ভাবেনি। অথচ মন্টু কর্তৃক মাস্টার কাকাকে খুন করার মধ্য দিয়েই যেন রাবেয়ার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কারণ ও তার করুণ পরিণতির মূল কারিগর হিসেবে মাস্টার কাকা ওরফে শরীফ আকন্দের মূল চরিত্র উন্মোচিত হয়। হারুনের স্ত্রী নাহার ভাবির সাথে মন্টুর কথোপকথনে যা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

> "রাবেয়ার মৃত্যুর কারণটাতো আপনি জানেন ভাবি। মাস্টার কাকাই হয়তো দায়ী ছিলেন, মন্টু জেনেছিল। অবশ্যি মন্টু বলেনি কিছুই।"[২০]

তবে একটি বিষয় খুব খেয়াল করা যায়, মাস্টার কাকাকে মন্টু খুন করলেও খুনের কারণটা মন্টু কাউকে জানায়নি, এমন কী মাস্টার কাকাকে অশ্রদ্ধা করেও কোনো বাক্য বলেনি। চাপা স্বভাবের এই মন্টু যেন বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী ব্যক্তিটাকে ঠিক চিনে নিয়েছিল এবং তাকেও অশ্রদ্ধা করতে চায়নি। বরং মন্টু তার অপার সম্ভাবনাময় জীবনকে খুনের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনের ট্র্যাজিক হিরোর মতো হয়ে উঠেছে। সমালোচকের ভাষায় -

> "একটি সম্ভাবনাময় জীবন ছিল মন্টুর। সে সাপ মারতে দ্বিধা করে না, অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে বড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতেও কশুর করে না; রাগে উন্মত্ত হয়ে রাবেয়ার মৃত্যুর নেপথ্য কারণ মাস্টার কাকাকেও খুনও করে। শুধু দারোগা-পুলিসের কাছেই নয়, আদালতে বিচারকের সামনে সে যদি সত্যটাকে প্রকাশ করতো তবে হয়তো তার ফাঁসির হুকুম নাও হতে পাররত। কিন্তু তা সে করেনি, মন্টুর শরীরে যত শক্তিই থাক তা বলে সে সমাজ-সত্যটাকে অস্বীকার করেনি। সমাজের কাছে এ পরিবারের সম্মানকে, সামাজিক প্রতিষ্টাকে ম্লান হতে দিতে পারে না। আত্মসম্মানহীন যে জীবন তা তার কাম্য নয়, তাই সে আদালতে দাঁড়িয়েও সামাজিক সত্যটাকে মেনে নেয়।"[২১]

আমরা যদি মাস্টার কাকার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাই আপাত দৃষ্টিতে একজন সাদাসিধে অকৃতদার স্কুল মাস্টারকে যার জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি রয়েছে অগাধ জ্ঞান ও আগ্রহ। কিন্তু এই মাস্টার কাকা আসলে পুরো উপন্যাসের সবথেকে রহস্যময় চরিত্র। বাবার কলেজ জীবনের বন্ধু যে কলেজ ছেড়েছিল অনিলা চৌধুরীর প্রতি দুর্বলতা এবং তার সঙ্গে নাম জড়িয়ে অন্য ছাত্ররা 'শকুন মামা ও শকুনি মামী' নাম দিয়ে পদ্য লিখে প্রচার করেছিল বলে। অনিলা চৌধুরীর প্রতি প্রবল প্রেমানুভূতি থাকলেও সে সম্পর্ক পূর্ণতা পায়নি। বন্ধুর পরিবারের সবার সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক থাকলেও মাস্টার তার অতৃপ্ত লিবিডো বা যৌন চেতনার দ্বারা এমনভাবে তাড়িত যে রাবেয়া নামক একটা নিষ্পাপ ফুলকে অকালে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মাস্টারকে খুনের দায়ে মন্টুর ফাঁসি হয়। খোকার ভালো চাকরি হলেও তা যেন পরিবারের কেউই আনন্দে উদযাপন করতে পারে না। একটা গোটা পরিবারের স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খা যেন নিমিষেই নষ্ট হয়ে যায় দুর্ঘটনার। আমাদের চারপাশেও এমন মুখোশধারী লিবিডো তাড়িত ধর্ষকাম পুরুষ চরিত্র দুর্লভ নয়।

মাস্টার কাকা তথা শরীফ আকন্দ কতৃক ধর্ষিত হয় রাবেয়া। বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতার শিকার তরুণী রাবেয়াকে যে তার কন্যাসম; তাকে মাস্টার কাকা নিজের কামনার দ্বারা তাড়িত হয়ে ধর্ষণ করবে এটা কেউ ভাবতেই পারেনি। তার মনোজগতের প্রকৃতি যেন সিগমুন্ড ফ্রয়েডের তত্ত্ব (১৯০০-১৯৩০) সুপ্তযৌন অবস্থার (লেটেন্সি স্টেজ) কথা মনে করিয়ে দেয়। মনোবিজ্ঞানের সাইকোডাইনামিক রূপটিও পরিলক্ষিত হয় - যেখানে মাস্টার কাকার সচেতন মন অচেতন আচরণের দিকে নিয়ন্ত্রিত হয়। অকৃতদার মাস্টার কাকা তার অবদমিত যৌন বাসনা নিবৃত্তির জন্য অবুঝ ও মানসিক প্রতিবন্ধকতার শিকার রাবেয়ার ইহ জীবনকে নরক যন্ত্রণার কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। সবার চোখের সামনে ভালো মানুষের যে খোলশ পরিধান করে ছিলেন মাস্টার কাকা, খোকার প্রতিক্রিয়া যেন তার সে রহস্যময় মুখোশটি উন্মোচন করে দিয়েছে। মানুষের মনের অবচেতন স্তরের কামনা-বাসনা কতটা ভয়ানক হতে পারে তার বাস্তব চিত্র দেখা যায় মাস্টার কাকা চরিত্রের মধ্য দিয়ে। মন্টু কতৃক মাস্টার কাকাকে খুন তাই পাঠকের চিত্তে মাস্টার কাকা কর্তৃক ঘৃন্য অপরাধের শাস্তি হিসেবেই বিবেচিত হয় যার দরুণ মাস্টার কাকার জন্য পাঠকের মনে কোন অনুকম্পা তৈরি হওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেয়। কিন্তু মন্টুর কথা স্মরণে আসতেই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মতো পাঠকের হৃদয় যেন দুঃখবোধে সমানভাবে আক্রান্ত হয়। মন্টুর বাবার ভাষ্যে -

> "মন্টুর জন্য বুকটা কাঁদে রে। তিমিরময়ী দুঃখ। প্রগাঢ় বেদনার অন্ধকার আমাদের গ্রাস করছে। বাইরে গাছের পাতায় বাতাস লেগে হা হা হা হা শব্দ উঠল।"[২২]

মন্টুর বাবার হৃদয়ের এই করুণ চিৎকার যেন পাঠককে অশ্রুসজল করে তোলে; বেদনায় মথিত হয় পাঠকের অন্তকরণ। মাস্টার কাকার কর্মফলে শুধু তার শাস্তিই হয়নি সাথে সাথে মন্টুর ফাঁসির আদেশ এবং এর সাথে সাথে তার গোটা পরিবারের উপর নেমে এসেছে বিষাদের কালো ছায়া। জ্যোতিসশাস্ত্র জেনে গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে মিল রেখে অন্যদের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারলেও নিজের পরিণতি সম্পর্কে কোন ধারণাই মাস্টার কাকার ছিল না। মন্টুর জন্ম নিয়ে মাস্টার কাকার ভবিষ্যৎ বাণী ছিল নিম্নরূপ-

> "মন্টু, যার জন্ম হয়েছিল মঘা নক্ষত্রযুক্ত সিংহ রাশিতে, রবির হোরায় বুধের দ্রোক্কাণে। কাকা বলেছিলেন এ ছেলে হবে সাহসী, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক।"[২৩]

হয়তো মন্টু সাহসী ছিল বলেই পরিবারের মর্যাদার কাছে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে ফাঁসির দড়ি নিজের গলায় তুলে নিয়েছিল। জীবনকে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেবার মতো এমন অসীম সাহস সবার থাকে না। মন্টুর ছিল বলেই উপন্যাসের ক্ষুদ্র ব্যাপ্তির মধ্যেও যেন মন্টুকে ট্রাজিক হিরো বলে ভাবা যায়।

উপন্যাসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শফিক-শাহানা দম্পতি। ছেলে মেয়ে নিয়ে সুখ-দুঃখের সংসার তাদের। প্রথম জীবনে শফিক সাহেব বেসরকারি স্কুলের মাসটার ছিলেন পরে ফার্মের অ্যাকাউন্ট্যান্ট হন। অর্থ না থাকলেও আত্ম অহমিকা ছিল যার প্রবল। কথক খোকার বর্ণনায় দেখা যায় তার স্বরূপ -

> "বাবা পেঙ্গুইন পাখির কলমদানি দেখে খুব রাগ করলেন। বাবার পয়সা ছিল না বলেই হয়তো অহংকার ছিল।শীলুদের পরিবারকে তাঁর একটুও পছন্দ হতো না। নিজে আজীবন কষ্ট পেয়েছেন, অন্যের সুখ সে কারণে সহজভাবে নেওয়ার মানসিকতা ছিল না।"[২৪]

শফিক সাহেবের মানসের একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় খোকার উক্ত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। আত্ম অহমবোধের জায়গাকে ঠিক রাখতে গিয়ে সমাজের ভয়ে যারা হৃদয়ের পুত্তলিকা প্রথমা কন্যাকে অগোচরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে কেবল যে রাবেয়ার জীবন বিপন্ন হয়েছে তা নয় রাবেয়ার জঠরে বেড়ে ওঠা প্রাণকে পৃথিবীর আলো দেখারও সুযোগ দেওয়া হয়নি। রাবেয়ার নির্বুদ্ধি সম্পন্ন কর্মকান্ডে বিরক্ত হয়ে কখনো বা বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার চিন্তা করেন। তাড়াহুড়ো করে অন্তঃসত্ত্বা রাবেয়াকে বিয়ে দিতে চেয়েও ব্যর্থ হন - ফলশ্রুতিতে গর্ভপাতের মতো জঘন্য কাজও করে ফেলেন তারা। ঘটনার ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলেও দুটি প্রাণকে যেন একসাথে শেষ করে দেওয়ার দায় কিছুতেই শফিক-শাহানা দম্পতি এড়িয়ে যেতে পারেন না। আবার এক সন্তান-রাবেয়াকে হারিয়ে ফেলার পর আরেক সন্তান মন্টুর ফাঁসির আদেশে পিত হৃদয়ের করুণ আর্তি যেন পাঠকের চিত্তকে গভীর মর্মবেদনায় আচ্ছন্ন করে তোলে। উপন্যাসে এর প্রতিফলন দেখা যায় -

> "ক্রস একজামিনেসনের শুরুতেই বাবা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ তিনি শব্দ করে কেঁদে ফেললেন। সবাই তাকাল তাঁর দিকে। আদালতে মৃদু গুঞ্জন সরব হয়ে উঠল।"[২৫]

স্বল্প কথা বললেও এবং উপন্যাসে বাবা চরিত্রের ব্যপ্তি কম পরিসরে হলেও সন্তানের প্রতি গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পায় উক্ত মন্তব্যে। লেখকের বর্ণনা ভঙ্গির চমৎকারিত্বে যেন পিতৃহৃদয়ের চিরাচরিত রূপটি পরিলক্ষিত হয়। এখানেই যেন পাঠকগণ তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে।

ছোটবোন রুনুও যেন উপন্যাসটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিশোরী রুনু যেন লক্ষ্মী মেয়ে। বয়স অল্প হলেও পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ ধারণা রাখে সে। কবিতা লেখে, ছবিও আঁকে। খোকার ট্রাঙ্কের এক কোণায় তার কবিতা লেখার খাতার খোঁজ পাওয়া যায়। বারোটি কবিতাও খোকা দেখতে পায় সেখানে। মাকে নিয়ে, পোষা কুকুর পলাকে নিয়ে, মন্টুর সাপ মারা নিয়েও সে কবিতা লিখেছে -

> "মন্টু ভাইতো মারলেন মস্ত বড় সাপ
> চার হাত লম্বা সেটি কী তার প্রভাব।"[২৬]

রুনুর এহেন সৃজনশীলতা যেন একটি কিশোরী বালিকার চমৎকার বেড়ে ওঠা ও পেলব হৃদয়ের সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রতিও রয়েছে তার অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এমনকি পাশের বাড়ির শীলু-নাহার ভাবির সাথেও রয়েছে তার সুসম্পর্ক। পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে কোমল হৃদয়ে কষ্ট পেলেও পরিবারের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিতে দেখা যায় তাকে।

প্রতিবেশি হারুনের মধ্যে রাবেয়া প্রতি দুর্বলতা ও ভালোবাসা পরিলক্ষিত হয়।ভালোবাসা থাকলেও মায়ের শঠ আচরণের কোন প্রতিবাদ করতে তাকে করতে দেখা যায় না। বরং তাকে নির্লিপ্তভাবে খালাতো বোনকে বিয়ে করে ফেলতে দেখা যায় -

> "হারুন ভাইয়ের বিয়ে হল নাহার ভাবির সঙ্গে। তাঁর খালাতো বোন, হোম ইকোনোমিক্সে বিএ পড়তেন। হারুন ভাই জার্মানি চলে গেলেন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি নিতে। আগেই সব ঠিক হয়েছিল। নাহার ভাবি সমস্তই জেনেছিলেন। বিয়ের সাতদিন না পেরোতেই তিনি আমাদের বাসায় এসে সবার সঙ্গে গল্প করলেন।"[২৭]

তবে নাহার ভাবির আন্তরিকতা দেখে হারুনের প্রতি অভিযোগটি যেন ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। তাদের পরিবারের শীলু ও নাহার ভাবি যেন একবোরেই তাদের মায়ের মতো না। মিষ্টভাষী, সদালপী নাহার ভাবির রয়েছে রাবেয়ার সাথে স্নেহশীল সম্পর্ক। শীলু ও যথেষ্ট সদালপী কিন্তু খোকা তাকে মনে মনে ভালোবসলেও, খোকার প্রতি তার অনুরাগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। একদিন তারা বাড়ি (শান্তি কটেজ) ছেড়ে অন্যখানে চয়ে যায় এবং তাদের সম্পর্কে আর বেশিকিছু জানা যায় না।

উপন্যাসের একেবারে শেষের দিকে মন্টুর খোঁজে একটি মেয়েকে আসতে দেখা যায়- নাম ইয়াসমীন। যে মন্টুর সাথেই পড়ে। মন্টু ও ইয়াসমীনের হৃদয়ের লেনা - দেনা হয়েছিল কী না তা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও মন্টুর ও তার পরিবারের প্রতি ইয়াসমীনের গভীর মমত্ববোধ যেন তার ভেতরকার মানবিক রূপটাই প্রকাশ করে।

এভাবেই মধ্যবিত্ত বাঙালি-বাংলাদেশি নর-নারীর ভেতরকার চিন্তা-মননশীলতা আবেগ-অনুরাগ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংকট যেন চমৎকার ও সাবলীল ভাষায় তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৭২ সালে নন্দিত নরকে প্রকাশিত হলেও এটি মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে লেখা হয়েছিল। এর নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। আহমদ শরীফের মতে -

> "মাসিক 'মুখপত্রে'র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যায় গল্পের নাম 'নন্দিত নরকে' দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কেননা ঐ নামের মধ্যেই যেন একটি নতুন জীবনদৃষ্টি, একটি অভিনব রুচি, চেতনার একটি নতুন আকাশ উঁকি দিচ্ছিল। লেখক তো বটেই, তাঁর নামটিও ছিল আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবু পড়তে শুরু করলাম ঐ নামের মোহেই।"[২৮]

সত্যিই উপন্যাসটির নামকরণে যেন আলাদা একটা ব্যঞ্জনার উপস্থিতি পাওয়া যায়। নন্দিত মানে সুন্দর কিংবা আনন্দিত এবং ধর্মীয় বিধান মতে নরক মানে মৃত্যুর পর পাপীদের শাস্তি লাভের স্থান অর্থাৎ নিকৃষ্টতম স্থান। ফুলে-ফলে সুশোভিত এই সুন্দর পৃথিবী যেন কারো কারো কাছে নরকে পরিণত হয়েছে এই উপন্যাসে। রাবেয়া, খোকা, মন্টুসহ পরিবারের সকলের জীবনই যেন এই নারকীয় যন্ত্রণায় বিদ্ধ। সেদিক থেকে বিপরীতার্থে ব্যবহৃত উপন্যাসের এমন নামকরণের প্রাসঙ্গিকতা যেন বিষয়বস্তুর সাথে পুরোপুরি মিলে যায়।

সরল ও সাবলীল ভাষ্যে কাহিনি প্রকাশ করতে যেয়ে কখনো কখনো প্রতীক রূপকেরও ব্যবহার করেছেন। আরো ব্যবহার করেছেন ঝরঝরে ইংরেজি শব্দের - ইনসমনিয়া (Insomnia), আউটিং (Outing), রাইফেল (Rifles), এবনরমালিটি (Abnormality), সাইকোলজি (Psychology), এবরশান (Abortion), ইনক্রিমেন্ট (Increment), এনেস্থেশিয়া (Anesthesia), হাইড্রোলজির (Hydrology) মতো অসংখ্য ইংরেজি শব্দের ব্যবহার করেছেন যা উপন্যাসের ভাষাকে দূষণীয় না করে বরং পাঠকের চেনা জানা জগতের সাথে একেবারে মিলিয়ে দিয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের নন্দিত নরকে উপন্যাসে লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গও অত্যন্ত চমৎকারভাবে উঠে এসছে। নিচের বক্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে তা আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে -

'কুকুরের কান্না নাকি অমঙ্গলের চিহ্ন' (পৃ. ১৮)
'কাকা বললো দেখেছিস কত তারা?
খুব যখন তারা ওঠে তখন দেশে দুর্ভিক্ষ হয় শুনেছি!' (পৃ. ২৫)
'আমি জেনেছি মীন রাশিতে আমার জন্ম। মীন রাশির লোক দার্শনিক আর ভাগ্যবান হয়।' (পৃ. ২৮)

উক্ত সংলাপগুলোর মধ্য দিয়ে জনমানুষের মনে প্রোথিত হয়ে থাকা চিরায়ত লোকবিশ্বাসকে ঔপন্যাসিক খুব চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। পরিবারকে যাপিত জীবনের কেন্দ্র হিসেবে আবিষ্কার ও প্রাত্যহিকতার অনুল্লেখ্য আলেখ্যে জীবনকে বিম্বিত করার যে শক্তি কথাশিল্পী হুমায়ূনের প্রধান গুণ, তার পূর্ণ প্রকাশ দেখি এ উপন্যাসে।[২৯]

কাহিনি বর্ণনায় এবং উপন্যাসের নর-নারীর মানস রূপায়ণে হুমায়ূন আহমেদ সিদ্ধহস্ত এর সাথে যুক্ত হয়েছে ঝরঝরে ভাষিক উপস্থাপন। ছোট ছোট বাক্যের বুননে জীবনের খুঁটিনাটি সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-আবেগ, মান-অভিমান, আনন্দ-

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 42
Website: https://tirj.org.in, Page No. 390 - 399
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিষাদের আলেখ্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি। চরিত্রসমূহের ভেতরকার ও বাহিরের জগৎ চিত্রণে, উপমা-রূপকের প্রাসঙ্গিকতায় লোকবিশ্বাসের বুনন যেন উপন্যাসটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে যেখানে মূল আখ্যানের ভিতর নর-নারীর জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব চিত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে হুমায়ূন আহমেদ তুলে এনেছেন। তিনি তাঁর *নন্দিত নরকে* যে প্রেক্ষাপট ও চরিত্রের মানসপট উপস্থাপন করেছেন তা বাংলা সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্র সংযোজন। এ উপন্যাসের মাধ্যমে যেন হুমায়ূন আহমেদ এক নতুন যুগের সূচনা করেছেন।

Reference:

১. হোসেন, সৈয়দ আকরম, ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ’, ১ম সং-১৯৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৭
২. চৌধুরি, সিরাজুল ইসলাম, ‘লিঙ্কনের নোটবুক’, ১ম সং- ১৯৯৪, আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, পৃ. ৯৬
৩. হালদার, গোপাল, ‘বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা’, ৪র্থ, সং ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, অরুণা প্রকশনি, কলকাতা, পৃ. ২২
৪. ভূইয়া, গোলাম কিবরিয়া, ‘বাঙলায় মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ’, বাংলা একাডেমি-১৯৯৫, ঢাকা, পৃ. ৪
৫. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং, ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৫১
৬. তদেব, পৃ. ২২
৭. তদেব, পৃ. ১২
৮. তদেব, পৃ. ১৬
৯. তদেব, পৃ. ৭৩
১০. তদেব, পৃ. ৬১
১১. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ২৬
১২. তদেব, পৃ. ২৬
১৩. তদেব, পৃ. ৯
১৪. তদেব, পৃ. ৯
১৫. তদেব, পৃ. ৩৩
১৬. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৪৬
১৭. তদেব, পৃ. ৫৪
১৮. তদেব, পৃ. ৫৬
১৯. তদেব, পৃ. ৫৭
২০. তদেব, পৃ. ৬৯
২১. মিরবর, কল্যাণ, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস (১৯৭১-১৯৮৭)’, ১ম সং-২০২০, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা-১২০৫, পৃ. ৩৫৫
২২. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৭০
২৩. তদেব, পৃ. ৭০
২৪. তদেব, পৃ. ৭০
২৫. তদেব, পৃ. ৬৭
২৬. তদেব, পৃ. ৩৮
২৭. আহমেদ, হুমায়ূন, ‘নন্দিত নরকে’, অন্যপ্রকাশ সং- ২০০৯, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ৩৭
২৮. তদেব, পৃ. মুখবন্ধ
২৯. আজম, মোহাম্মদ, ‘হুমায়ূন আহমেদ : পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য’, ১ম সং - ২০২০, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ৬৭